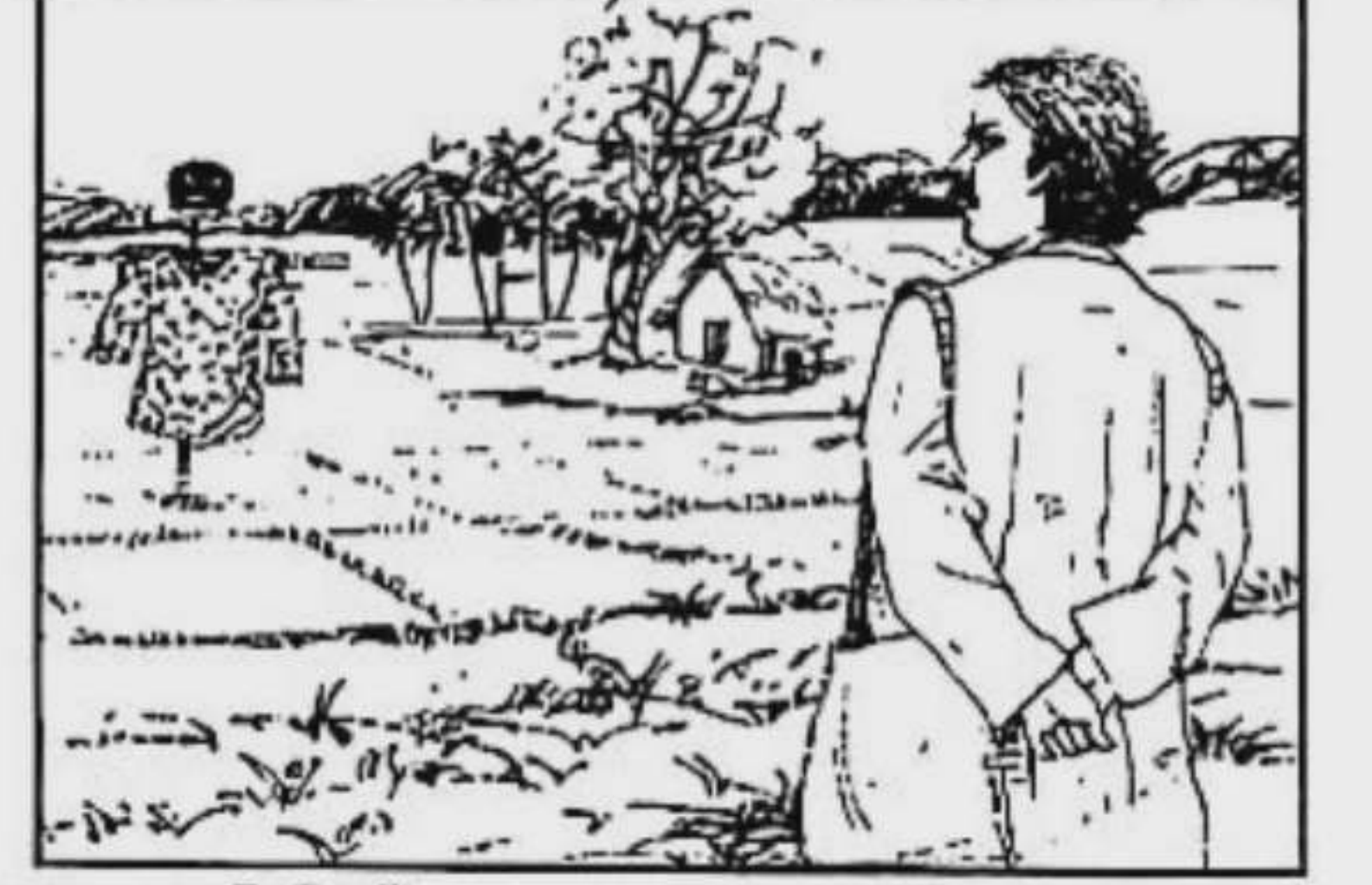


## কাকতাদুয়া সত্যজিৎ রায়

## গল্পটির মূলভাব

'কাকতাদুয়া' গল্পে সত্যজিৎ রায় কুসংস্কারের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরেছেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে মানবমনে বিচিত্রসব অনুভূতির প্রকাশ ঘটতে পারে। গল্পে একটি অনুষ্ঠান শেষে ব্যক্তিগত গাড়িতে করে কলকাতা ফিরছিলেন লেখক মৃগাঙ্কবাবু। পথে গাড়ির পেট্রোল ফুরিয়ে যাওয়ায় গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার তেল আনতে যান। এই অবকাশে মৃগাঙ্কবাবুর চোখে পড়ল ধু-ধু মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি কাকতাদুয়া। তিনি লক্ষ করলেন কাকতাদুয়ার গায়ে পরানো আছে তিন বছর আগে ত্যাগিয়ে দেওয়া তাঁর গৃহকর্মী অভিরামের লাল-কালো ছিটের শার্ট। ওবার কথায় মৃগাঙ্কবাবুর বাবা স্বর্ণের ঘড়ি চুরির অভিযোগে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। অভিরাম নিজের বাড়িতে এসে অর্থ-কষ্টে ও রোগে মারা যায়। সেই অভিরাম কাকতাদুয়ারূপে লেখককে জানায় যে, আলমারির নিচে পিছন দিকটায় ঘড়িটি এখনও গড়ে আছে। আসলে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। বাড়ি ফিরে তিনি আলমারিরতলা থেকে ঘড়িটি খুঁজেও পেলেন। অভিরামের মাধ্যমে মৃগাঙ্কবাবুর প্রাপ্ত তথ্য সত্যিকার অর্থে অবচেতনে লুকিয়ে থাকা সত্যেরই প্রকাশ। তিনি বুঝতে পারলেন ওবার কথা ঠিক ছিল না। তাই মৃগাঙ্কবাবু সিদ্ধান্ত নেন ভবিষ্যতে কোনো ওবার সাহায্য নেবেন না। কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাস কখনো ভালো ফল বয়ে আনতে পারে না, এ সত্যটিই এ গল্পে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।



## গল্পটির শিখনফল : গল্পটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : কাজের লোকের প্রতি সহনশীল হতে শিখব।
- শিখনফল-২ : বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আগ্রহী হব।
- শিখনফল-৩ : সাহসী হতে পারব।

## লেখক-পরিচিতি

নাম : সত্যজিৎ রায়।

জন্ম সাল : ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান : কলকাতা।

পেশা / কর্মজীবন : ডি. জে. কিমার বিজ্ঞাপন সংস্থার জুনিয়র ভিসুয়লাইজার পদে কাজ, চলচ্চিত্র পরিচালনা ও নির্মাণ।

সাহিত্য সাধনা : প্রমথ : কৈলাস কেলেকারি, সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু, জয় বাবা ফেলুনাথ, মোল্লা নাসিরুদ্দীনের গল্প, একের পিঠে দুই, যত কাণ্ড কাঠমাত্তে।

পুরস্কার/সম্মাননা : চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদানের জন্য অস্কার পুরস্কার ও ভারতরত্ন উপাধি লাভ।

মৃত্যু : ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ।



## অনুশীলন



মূল্যায়ন পদ্ধতির সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে  
১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, NC'TB প্রদত্ত চূড়ান্ত নম্বর বটন অনুযায়ী অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় আনন্দপাঠ অংশ থেকে বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে। মাস্টার ট্রেনার প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ নিচে সংযোজিত হলো। পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য প্রগোস্তরগুলো বুঝে প্র্যাকটিস কর।

## গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর



## বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত

## বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০১

ক. মৃগাঙ্কবাবু কোথায় গিয়েছিলেন? গাড়ি মাঝপথে থেমে যাওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

খ. কাকতাদুয়া তৈরির উপাদান ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ৭

১নং প্রশ্নের উত্তর ৫৯

ক. মৃগাঙ্কবাবু দুর্গাপুর ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সম্মাননা স্মারক নিতে গিয়েছিলেন।

মৃগাঙ্কবাবু একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক। দুর্গাপুরের একটি ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাকে সাহিত্য সম্মাননা তথা মানপত্র গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ট্রেনের রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি বলে তিনি মোটরে যাত্রা করেছেন। মোটর চালানো শুরুর পূর্বে তিনি তার চাকর সুধীরকে বলেছিলেন পেট্রোল যা আছে তা দিয়ে হবে না। কিন্তু সুধীর সেই কথা বিশ্বাস করেনি। কারণ পেট্রলের ইনডিকেটর যে পরিমাণ তেলের নমুনা জানিয়েছিল, তাতে তাদের ভ্রমণ নিঃসন্দেহে



শেষ করা সম্ভব। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু জানতেন এই ইনডিকেটর ঠিক তথ্য দিচ্ছে না, বেশ কিছুদিন যাবৎ এটায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। তবু তিনি সুধীরের কথার ভরসায় পেট্রোল না নিয়েই যাত্রা করেছিলেন। তাই যাত্রাপথের মাঝখানে পেট্রোল ফুরিয়ে যাওয়ায় গাড়ি থেমে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মৃগাঙ্কবাবুর সন্দেহটাই ঠিক হলো।

**খ** ফসলের মাঠে পাখিদের হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য বাঁশের কাঠি, হাঁড়ি ও জামা দিয়ে তৈরি মানুষের কৃত্রিম অবয়ব হচ্ছে কাকতাদুয়া।

গ্রাম এলাকায় কাকতাদুয়া একটি সাধারণ বস্তু। ফসলের মাঠে সচরাচর এটি চোখে পড়ে। সাধারণত ছোট দানার শস্য যেমন— ধান ডাল, তিল, সূর্যমুখী এবং বিভিন্ন ধরনের সবজি যেগুলো পাখি ও পোকামাকড়ের আক্রমণের শিকার হয়, সেই জাতীয় ফসল ও শাকসবজি সার্বক্ষণিক পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাকতাদুয়া তৈরি করা হয় যা, একজন মানুষের পক্ষে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সহজ কাজ নয়। তাই মানুষের আকৃতি দিয়ে পাখি ও পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রাচীনকাল থেকে কাকতাদুয়ার ব্যবহার প্রচলিত। কাকতাদুয়া তৈরি খুবই সহজ কাজ। মাঝারি আকৃতির একটি বাঁশ শক্ত করে পুঁতে নিতে হবে। তারপর বাঁশের উপরের দিক থেকে খানিকটা নিচে বাঁশের কঙ্কি বা যেকোনো কাঠি আড়াআড়ি করে বেঁধে নিতে হবে। এবার অব্যবহৃত পুরাতন পোশাক জামা, শার্ট, ফতুয়া কিংবা পাঞ্জাবি আড়াআড়ি বাঁধা কঙ্কির দুপাশে গলিয়ে দিতে হবে ওই কাপড়ের আন্তিন দুটোর মধ্যে। এবার ব্যবহার্য কালি মাখা হাঁড়ি চড়িয়ে দিতে হবে বাঁশের মাথায়। হাঁড়ি উপড় করার পর কালো হাঁড়ির ওপর সাদা রং দিয়ে চোখ ও মুখ একে দিলেই হয়ে যাবে কাকতাদুয়া। কাকতাদুয়ার উপকারিতার দিক অনেক। এটি ফসলি ক্ষেতের সার্বক্ষণিক পাহারাদার। এটি পাখি ও পোকামাকড়ের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করে। ফসল সংরক্ষণ ও গুণগত মান বজায় রেখে তোলায় এটি ভূমিকা রাখে। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেশে কাকতাদুয়ার ব্যবহার দেখা যায়। কাকতাদুয়া একটি উপকারী কৃত্রিম মানুষ। রাতের বেলায় চোরও বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে এই কৃত্রিম অবয়ব দেখে।

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০২

- ক. 'কাকতাদুয়া' গল্পের শিক্ষণীয় দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩  
খ. গল্পে উল্লিখিত পরিবেশ, সময় ও আবহাওয়ার বর্ণনা দাও। ৭

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'কাকতাদুয়া' গল্পের শিক্ষণীয় দিকটি হলো চোর ধরার কাজে ওঝার সাহায্য নেওয়ার মতো কুসংস্কারকে পরিহার করা।

'কাকতাদুয়া' গল্পে সত্যজিৎ রায় কুসংস্কারের ক্ষতিকর দিকটি তুলে ধরেছেন। বিশেষ পরিবেশে মানব মনে বিচিত্র সব অনুভূতির প্রকাশ ঘটতে পারে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মৃগাঙ্কবাবু। তার বাবার স্বপ্নের ঘড়ি হারিয়ে গিয়েছিল তিন বছর আগে। তাদের সন্দেহ হয় বিশ বছর তাদের বাড়িতে কাজ করা পুরাতন চাকর অভিরামকে। অভিরাম আসলে এসবের কিছুই জানত না। সে বারবার অস্বীকার করায় মৃগাঙ্কবাবুর বাবা চোর ধরার জন্য ওঝার সাহায্য নেন। ওঝা কুলোতে চাল ছুড়ে মেরে প্রমাণ করে দেয় যে, ঘড়ি অভিরাম নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নের ঘড়িটি আলমারি খুলতে গিয়ে আলমারির নিচে পড়ে গিয়েছিল। তিন বছর পর মৃগাঙ্কবাবু অবচেতনে তা দেখতে পান। বাড়ি ফিরে দেখেন আসলেই ঘড়িটি আলমারির নিচে পড়ে আছে। এই গল্পের শিক্ষণীয় দিকটি এই যে, সন্দেহের বশে কারও ওপর দায় চাপাতে ওঝার সাহায্য নেওয়া ঠিক নয়।

**খ** 'কাকতাদুয়া' গল্পে উল্লিখিত পরিবেশ, সময় ও আবহাওয়া সম্পর্কে নিচে বর্ণনা করা হলো—

'কাকতাদুয়া' গল্পে উল্লিখিত সময়টা হলো মাঘ মাস। অর্থাৎ তখন শীতকাল। পেট্রোল ফুরিয়ে গিয়ে মৃগাঙ্কবাবুর গাড়ি যেখানে থামে তার নাম পানাগড়। তবে পানাগড় বন্দর থেকে স্থানটি তিন মাইল দূরে। বন্দর এলাকা থেকে দূরে হওয়ায় এই স্থানে কোনো জনবসতি নেই। চারদিকে শুধু ধু-ধু মাঠ। আর তাদের গাড়ি এসে পৌঁছেছে দুপুর সাড়ে তিনটায়। এসময় গ্রামের মানুষ গোসল, খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম নেয়। তাছাড়া এলাকাটি দুর্গম হওয়ায় লোকজন নেই।

মাঘ মাস, তাই ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে। অনেক দূরে একটি কুঁড়েঘর তেঁতুল গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এটি রাস্তার পূর্ব পাশের দিক। আরও দূরে এক সারি তালগাছ দেখা যায়। তারপর যা কিছু আছে সবই যেন জমাট বাঁধা বন।

রাস্তার অন্য পাশেও বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। রাস্তা থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে একটি পুকুর রয়েছে। তাতে পানি তেমন নেই। দু-একটা বাবলা গাছ ছাড়া গাছপালা যা আছে সব দূরে। এ দিকেও দুটো কুঁড়েঘর রয়েছে তবে মানুষের চিহ্ন নেই। মাঘ মাস হলেও রোদের তেজ প্রখর। আকাশে মেঘ দেখা গেলেও এদিকে রোদ। মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটা কাকতাদুয়া।

সূর্য যত অস্ত যাচ্ছে মেঘগুলো তত মাথার ওপর আসতে শুরু করেছে। ঠান্ডা বাতাস বাড়ছে। সূর্য অস্ত গেলে ঠান্ডা আরও বাড়তে শুরু করেছে। মাঠের মধ্যে যে শীতের ফসলি ক্ষেত রয়েছে, তারই মাঝখানে কাকতাদুয়াটা। কাকতাদুয়া কৃত্রিম হলেও পাখির সত্যিকার মানুষ ভেবে ভয় পায়। মেঘের ফাটল দিয়ে কাকতাদুয়ার গায়ে পড়ছে রোদ। এ সময় কাজ হয় না বলে গ্রামের মাঠে-ঘাটে লোকজন কম দেখা যায়। তাই এক রকম নির্জনতা কাজ করেছে চারপাশে। রাস্তা দিয়ে কয়েকটা গাড়ি গেলেও কেউ মৃগাঙ্কবাবুকে ডেকে তার সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করে না। তাই তিনি চা খান ফ্লাস্ক থেকে বের করে।

'কাকতাদুয়া' গল্পে শীত মৌসুমে দুর্গম গ্রামের আবহাওয়া ও পরিবেশকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৩

- ক. চোর শনাক্ত করার জন্য মৃগাঙ্কবাবুর বাবার কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩  
খ. 'কাকতাদুয়া' গল্পের মূলভাব বর্ণনা করো। ৭

### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** চোর শনাক্ত করার জন্য মৃগাঙ্কবাবুর বাবা ওঝার সাহায্য নেন।

'কাকতাদুয়া' গল্পের প্রধান চরিত্র মৃগাঙ্কবাবু। তিন বছর আগে আর স্বপ্নের ঘড়িটি চুরি হয়েছিল বাড়ি থেকে। মৃগাঙ্কবাবুর বাড়িতে কাজ করত অভিরাম নামের এক চাকর। অভিরাম বিশ বছর ধরে সততার সাথে কাজ করলেও মৃগাঙ্কবাবুর বিয়েতে পাওয়া স্বপ্নের ঘড়িটি খুঁজে না পেয়ে অভিরাম সেটা চুরি করেছে ভেবে সন্দেহ করে। সেটা বহুবার জিজ্ঞাসাবাদের পরও অভিরাম অস্বীকার করে। তাই চোরকে শনাক্ত করার জন্য মৃগাঙ্কবাবুর বাবা কুসংস্কারের পরিচয় দেন। তিনি ওঝা ডেকে নিয়ে আসেন চোর ধরার জন্য। ওঝা কুলোতে চাল ছুড়ে মেরে প্রমাণ করে যে, অভিরামই চোর। চুরির অভিযোগে তারা অভিরামকে চাকরিচ্যুত করে। মৃগাঙ্কবাবুর বিয়েতে পাওয়া ঘড়ি উন্মারে ওঝার সাহায্য নিয়ে অভিরামকে চোর সাব্যস্ত করার প্রক্রিয়া মৃগাঙ্কবাবুর বাবার কুসংস্কারের পরিচয় বহন করে।

**খ** 'কাকতাদুয়া' গল্পে সত্যজিৎ রায় কুসংস্কারের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরেছেন।

'কাকতাদুয়া' গল্পটি একটি উপদেশমূলক গল্প। খ্যাতনামা সাহিত্যিক মৃগাঙ্কবাবু এ গল্পের প্রধান চরিত্র। সাহিত্য সভায় সম্মাননা পেয়ে ফেরার পথে মাঝখানে এসে পেট্রোল ফুরিয়ে যাত্রায় বিঘ্ন ঘটে তার।



চাকর সুধীর তেল আনতে পানাগড়ে গেলে গাড়িতে বসে আড়াই ঘণ্টা কাটানো তার পক্ষে অসহ্যকর হয়ে ওঠে। তাই তিনি চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করেন। কিন্তু দুর্গম এই অঞ্চলটি প্রায় জনবসতিহীন। একেই মাঘ মাস, ফসল তোলার পর কর্মব্যস্ততা নেই; তার ওপর দুর্গম। মৃগাঙ্কবাবু কেবল পাশে একটি খেতে একটি কাকতাদুয়া দেখতে পেলেন যার গায়ে জড়ানো একটি লাল-কালো ছিটের শাট। শাট দেখে তার বিভ্রম ঘটে এবং তিনি গাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

বিশেষ পরিস্থিতিতে মানবমনে বিচিত্রসব অনুভূতির প্রকাশ ঘটতে পারে। ছিটের সাদা-কালো শাটটির মতো একটি শাট মৃগাঙ্কবাবু তাদের পূর্বতন চাকর অভিরামকে উপহার দিয়েছিলেন। অভিরাম তাদের বাড়ির বিশ বছরের পুরাতন চাকর। কিন্তু বুড়ো বয়সে সে স্বর্ণের ঘড়ি চুরি করেছে বলে দাবি করে বসেন মৃগাঙ্কবাবুর বাবা। মৃগাঙ্কবাবুর বিয়েতে পাওয়া স্বর্ণের ঘড়ি হারিয়ে গেলে সবাই সন্দেহ করে অভিরামকে। কিন্তু নিরপরাধ অভিরাম তা অস্বীকার করে। ফলে মৃগাঙ্কবাবুর বাবা চোর ধরার জন্য ওঝা ডেকে নিয়ে আসেন। ওঝা কুলোয় চাল ছুড়ে দিয়ে প্রমাণ করে দেয় অভিরাম চোর। স্বর্ণের ঘড়ি চুরির দায়ে অভিরামের চাকরি চলে যায়। অভিরাম আর কোথাও চাকরি পায় না। শেষ বয়সে অর্থের অভাবে কষ্টে ধুঁকে ধুঁকে তার মৃত্যু হয়।

মৃগাঙ্কবাবু গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে অবচেতনে দেখতে পান কাকতাদুয়া বেশধারী অভিরামকে। অভিরাম তাকে আলমারির নিচে পড়ে থাকা ঘড়িটির কথা বলে যায়। বাড়ি গিয়ে ঠিক সেখানেই ঘড়িটি পান মৃগাঙ্কবাবু। তখন থেকে তিনি শপথ করেন ভবিষ্যতে কোনো কিছু হারানো গেলে আর ওঝার কাছে যাবেন না।

এ গল্পে প্রকাশ পেয়েছে, সত্য কোনোদিন চাপা থাকে না। সত্য নিজগুণে প্রকাশ পায়। আর কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাস কখনো ভালো ফল বয়ে আনতে পারে না, এ সত্যটিই এ গল্পে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

#### বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৪

ক. চাকরি চলে যাওয়া অভিরামের জীবনে কীরূপ প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা কর। ৩

খ. 'কাকতাদুয়া' গল্পের চরিত্রগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ৭

#### ৫০ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ৫০

❏ চাকরি চলে যাওয়া অভিরামের জীবন নাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'কাকতাদুয়া' গল্পের অভিরাম একজন বিশ্বস্ত চাকর। সে খ্যাতনামা সাহিত্যিক মৃগাঙ্কবাবুদের বাড়িতে কাজ করত। বিশ বছর সে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেছে। একদিন মৃগাঙ্কবাবুর বিয়েতে পাওয়া স্বর্ণের ঘড়িটি হারিয়ে যায়। সকলে অভিরামকে সন্দেহ করে এবং ওঝা ডেকে কুলোয় চাল ছুড়ে প্রমাণ করে দেয় যে, সেই চোর। চুরির অপবাদে অভিরামের চাকরি চলে যায়। তারপর আর সে কোথাও কাজ করেনি। কারণ তার কঠিন রোগ হয়। তার টাকা-পয়সাও ছিল না। উদুরি রোগে ভুগতে থাকে সে। ঔষধ-পথ্য জোগাড় করার সামর্থ্য ছিল না তার। সেই পেটের পীড়ায় ভুগেই মারা যায় সে। মৃত্যুর অনেকদিন পর প্রমাণিত হয় সে চোর ছিল না। কেননা ঘড়িটি আলমারি খোলার সময় নিচে পড়ে গিয়েছিল। ফলে বিনা অপরাধে বিনা চিকিৎসায় ভুগে মরতে হয় অভিরামকে।

❏ 'কাকতাদুয়া' গল্পের চরিত্রগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো— 'কাকতাদুয়া' গল্পের প্রধান চরিত্র মৃগাঙ্কবাবু। তিনি খ্যাতনামা সাহিত্যিক। বিভিন্ন পত্রিকায় তার লেখা বের হয়। সম্প্রতি তাকে দুর্গাপুর ক্লাব থেকে সম্মাননা দেওয়া হয়। সম্মাননা নিয়ে ফেরার পথে তিনি পুরোনো দিনের একটি সত্যও উদ্ঘাটন করেন। পূর্বতন চাকর অভিরামকে তারা চুরির দায়ে বাড়ি থেকে বের করে দিলেও অভিরাম ছিল নির্দোষ। বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ পরিবেশে অবচেতনে তিনি এই সত্যের সম্মান পেয়েছেন। তিনি অনুশোচনাদগ্ধ হয়েছেন এই ঘটনা

থেকে। ভবিষ্যতে কোনো জিনিস হারানো গেলে তিনি আর এমন কুসংস্কারের আশ্রয় নেবেন না বলে শপথ করেছেন।

'কাকতাদুয়া' গল্পের বিশ্বস্ত চরিত্র অভিরাম। সে মৃগাঙ্কবাবুর বাড়ির পুরাতন চাকর। বিশ বছর পর্যন্ত সে খুবই বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবুর বিয়েতে পাওয়া স্বর্ণের ঘড়ি খুঁজে না পেয়ে সবাই অভিরামকে সন্দেহ করে। এক প্রকার বিনা অপরাধে চুরির দায়ে চাকরি চলে যায় তার। চাকরি হারিয়ে উদুরি রোগে আক্রান্ত হয় সে। শেষমেশ বিনা চিকিৎসায় রোগে ভুগে মরতে হয় তাকে।

'কাকতাদুয়া' গল্পের মৃগাঙ্কবাবুর বাবা অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। তিনি তার বিশ বছরের পুরোনো চাকরকে ঘড়ি চুরির দায়ে সন্দেহ করেন। অভিরাম অস্বীকার করলেও তিনি তা মেনে নেন না। চোর শনাক্ত করার জন্য তিনি ওঝা ডেকে নিয়ে আসেন। ওঝা কুলোয় চাল ছুড়ে দিয়ে অভিরামকে চোর প্রমাণ করলে তিনি তা বিশ্বাস করে অভিরামকে চাকরিচ্যুত করেন।

'কাকতাদুয়া' গল্পের মৃগাঙ্কবাবুর নতুন চাকর সুধীর। সে বেখেয়ালি। গাড়ির পেট্রোল পরীক্ষা করতে বললেও সে তার করেনি। ফলে মাঝ পথে গাড়ি বন্ধ হয়ে গিয়ে যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে। তাছাড়া সুধীর দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করে না। ঘরদোর ঠিকমতো ঝাড় দেয় না। মৃগাঙ্কবাবুর অবচেতনে অভিরাম এসে বলেছে সুধীর ঠিকমতো ঘর ঝাড়ু দিলে অনেক আগেই স্বর্ণের ঘড়ি পাওয়া যেত। সে আলমারির নিচে কখনো ঝাড়ু দেয় না। তাই বলা যায়, সুধীর চরিত্রটি তার দায়িত্বে অবহেলা করে।

#### বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৫

ক. "কিন্তু আজ পাঁজিতে যাত্রা নিষিদ্ধ বললে তিনি অবাক হবেন না।"— কথাটি ব্যাখ্যা কর। ৩

খ. "বিশেষ পরিস্থিতিতে মানবমনে বিচিত্রসব অনুভূতির প্রকাশ ঘটতে পারে।"— 'কাকতাদুয়া' গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৭

#### ৫০ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ৫০

❏ "কিন্তু আজ পাঁজিতে যাত্রা নিষিদ্ধ বললে তিনি অবাক হবেন না।"— এ কথাটির মাধ্যমে রাস্তায় দুর্ঘোণে পড়ে কুসংস্কারেও অবাক না হওয়ার দিকটি বোঝানো হয়েছে। এখানে পাঁজি হলো পাঞ্জিকা, যেখানে সন, তারিখ, তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি লেখা থাকে। অনেকেই পাঞ্জিকা দেখে যাত্রা শুভ-অশুভ নির্ধারণ করে থাকেন। আর এটি মূলত কুসংস্কার হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু খ্যাতনামা জনপ্রিয় সাহিত্যিক মৃগাঙ্কবাবুর মুখোপাধ্যায় তাঁর যাত্রাপথে গাড়ি নিয়ে আটকে যাওয়ায় তাঁর বিশ্বাসে কিছুটা প্রভাব ফেলে। কারণ দুর্গাপুরে একটি ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁকে মানপত্র দেওয়া হবে বলে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ট্রেনে রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি বলে মোটরেই তাঁকে সেখানে যাত্রা করতে হয়। সকালে চা খেয়ে বেরিয়েছিলেন, আর ফেরার পথে ঘটে এক দুর্ঘোণ। পানাগড়ের কাছাকাছি এসে তাঁর গাড়ির পেট্রোল কুরিয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে থাকা ড্রাইভার সুধীরকে আগেই এ ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু সুধীর তাতে গুরুত্ব দেয়নি। সুধীর তেল আনার জন্য মাইল তিনেক দূরের পানাগড়ে চলে যায়। জনমানবহীন সেই জায়গায় একটি কাকতাদুয়া ছাড়া আর কেউই ছিল না। সেই অবস্থায় মৃগাঙ্কবাবুকে দু-আড়াই ঘণ্টা একা কাটাতে হবে। তাই তিনি ভাবলেন পাঞ্জিকায় যদি কেউ আজ যাত্রা নিষিদ্ধ বলে তাহলে তিনি অবাক হবেন না।

❏ "বিশেষ পরিস্থিতিতে মানবমনে বিচিত্রসব অনুভূতির প্রকাশ ঘটতে পারে।"— উক্তিটি যথার্থ। বিশেষ কোনো মুহূর্তে মানুষ যখন পতিত হয় তখন তার মানসিকতায় নানা ধরনের চিন্তা-দুশ্চিন্তার আনাগোনা দেখা যায়। সেই সময়ে মানুষের মধ্য যেসব অনুভূতি প্রকাশ পায় সেগুলো স্বাভাবিক কোনো পরিস্থিতি থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে থাকে। কেননা বিশেষ সেই মুহূর্তটি মানুষের চিন্তা-



চেতনার জগৎকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। কেননা মানুষের মন অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখায়। মানবমনের বিচিত্র দিকটি ‘কাকতাদুয়া’ গল্পে মৃগাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

‘কাকতাদুয়া’ গল্পের প্রথম দিকেই আমরা মৃগাঙ্কবাবুর মেজাজে পরিবর্তন লক্ষ্য করি। পানাগড়ের কাছাকাছি এসে তার গাড়ির পেট্রোল ফুরিয়ে গেলে সুধীর তেল আনার জন্য পানাগড়ে যাওয়ার কথা বলে। মৃগাঙ্কবাবু যখন শুনলেন পানাগড় তাদের অবস্থান থেকে মাইল তিনেক দূরত্বের পথ আর তাকে দু-আড়াই ঘণ্টা সেখানে একা কাটাতে হবে তখন সুধীরের ওপর তিনি রাগান্বিত হন। কেননা সুধীরের খামখেয়ালির জন্যই তাকে এমন বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। এখানে সেই বিশেষ মুহূর্তে মৃগাঙ্কবাবু তাঁর মেজাজ হারিয়ে ফেললেন। অথচ তিনি ছিলেন একজন ঠান্ডা মেজাজের মানুষ। আবার মৃগাঙ্কবাবু কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন না। অথচ তিনি যখন যাত্রাপথে বিপদে পড়লেন তখন তাঁর বিশ্বাসে কিছুটা ভাটা পড়ে। সেই অবস্থায় যদি কেউ তাঁকে বলত তাঁর পঞ্জিকায় যাত্রা নিষিদ্ধ ছিল তাতেও তিনি অবাক হতেন না। ফলে এখানেও বিশেষ মুহূর্তে মানবমনের বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশের বিষয়টি লক্ষণীয়।

সুধীর যখন মৃগাঙ্কবাবুকে একা ফেলে চলে গেল তখন থেকেই তার অনুভূতির পরিবর্তন হতে লাগল। একটা মাঠের মধ্যে যে কাকতাদুয়াটা দাঁড়িয়ে ছিল সেটি তাঁর চিন্তার জগতে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে লাগল। কেন যেন মৃগাঙ্কবাবু অনুভব করছিলেন প্রতি মুহূর্তেই সেই কাকতাদুয়াটা তাঁকে বেশি করে আকর্ষণ করছিল। তিনি ছিলেন কুসংস্কারে অবিশ্বাস করা একজন মানুষ। অথচ সেই জনমানবহীন বিশেষ পরিস্থিতিতে কাকতাদুয়াকে নিয়ে তাঁর মনে যেসব জল্পনা-কল্পনার উদ্বেক হয়েছিল সেগুলো রীতিমতো পাঠককে আশ্চর্যান্বিত করে। কাকতাদুয়াটিকে তিনি একটি নকল মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে লাগলেন। সেটির দিকে তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে কতকগুলো জিনিস লক্ষ্য করে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর কাছে যেন মনে হতে থাকে কাকতাদুয়াটির চেহারায় সামান্য পরিবর্তন হয়েছে, হাত দুটো স্থানিকটা নিচের দিকে নেমে এসেছে। তাঁর কাছে মনে হতে থাকে এটার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা যেন আরেকটু জ্যাম্ব মানুষের মতো। খাড়া বাঁশটার পাশে যেন তিনি আরেকটা বাঁশ দেখতে পেলেন, আর কাকতাদুয়ার দুটো বাঁশ যেন তখন তাঁর কাছে ঠ্যাং মনে হলো। এসব চিন্তা করতে করতে তিনি কাকতাদুয়াটিকে একটি জ্যাম্ব মানুষ হিসেবে আবিষ্কার করলেন, যেটি একসময় ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসে। সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে মৃগাঙ্কবাবুর মনে এভাবেই বিচিত্রসব অনুভূতির প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। এসব দিক বিবেচনায় বলা যায়, প্রগোস্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৬

ক. “কিন্তু তাতে তাঁর মজ্জাগত দোষগুলোর কোনো সংস্কার হয়নি।”— কথাটি বুঝিয়ে লেখ। ৩

খ. “কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাস কখনো ভালো ফল বয়ে আনতে পারে না।”— ‘কাকতাদুয়া’ গল্পের আলোকে কথাটির সত্যতা যাচাই কর। ৭

### ০৬নং প্রশ্নের উত্তর ০৬

ক. “কিন্তু তাতে তাঁর মজ্জাগত দোষগুলোর কোনো সংস্কার হয়নি।”— কথাটির মাধ্যমে মৃগাঙ্কবাবু বাঙালি হিসেবে নিজের স্বার্থপর মনোভাবের দিকটিকে বুঝিয়েছেন। তিনি মনে করেন বাঙালি বড় স্বার্থপর। তারা সব সময় নিজ স্বার্থটাই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তারা নিজেদের ক্ষতি করে কখনোই অন্যের উপকার করবে না। এ ব্যাপারটি অবশ্য মৃগাঙ্কবাবু নিজের সঙ্গেই ঘটতে দেখেন। দুর্গাপুরে একটি ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয় মানপত্র দেওয়া হবে বলে। তিনি ট্রেনে রিজার্ভেশন না পেয়ে মোটরে যাত্রা করেন সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য। সেখান থেকে

ফেরার পথে তাঁর গাড়ির পেট্রোল ফুরিয়ে যায় পানাগড়ের কাছাকাছি এসে। তাঁর গাড়িটি যেখানে থেমে যায় সেখান থেকে পানাগড় মাইল তিনেক দূরে অর্থাৎ দু-আড়াই ঘণ্টা তাঁকে সেখানে বসে থাকতে হয়। তাঁর সঙ্গে থাকা ড্রাইভার সুধীর তাকে সেখানে একা রেখে পানাগড়ে চলে যায় তেল আনার জন্য। মৃগাঙ্কবাবু সেখানে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন বিষয় ভাবতে লাগলেন। সেই মুহূর্তে দুটি অ্যান্ডারসডার আর একটা লরি তাঁর পাশ দিয়ে চলে যায়। কিন্তু কেউ তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করার জন্য থামেনি। তিনি মনে মনে বললেন বাঙালিরা এ ব্যাপারে বড় স্বার্থপর হয়ে থাকে। নিজের অনুবিধা করে পরের উপকার করাটা তাদের কুষ্ঠিতে তারা কখনোই লেখে না। পরে তিনি বাঙালি হিসেবে নিজেকেও একই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করলেন। অন্য কেউ বিপদে পড়লে হয়তো তিনিও একইভাবে পাশ কাটিয়ে চলে যেতেন। তাই ভাবলেন, লেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতি থাকলেও, তাতে তাঁর মজ্জাগত দোষগুলোর কোনো সংস্কার হয়নি।

খ. “কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাস কখনো ভালো ফল বয়ে আনতে পারে না।”— মন্তব্যটি পুরোপুরি সত্য। কুসংস্কার মূলত মানুষের অবৈজ্ঞানিক ও ভিত্তিহীন চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্বাসের ফসল। এটি মানুষের চিন্তাভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে, অযৌক্তিক ভয়-ভীতি সঞ্চার করে এবং সমাজে অশান্তি ছড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি কুসংস্কারের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে অনেক সময় নির্দোষ মানুষকে অন্যায় অপবাদ দিয়ে তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা হয়। কুসংস্কারে বিশ্বাস যে মানুষের জীবনে কখনো ভালো ফল বয়ে আনে না এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ‘কাকতাদুয়া’ গল্পে। এ গল্পে অভিরামের জীবনে কুসংস্কারের প্রভাবটি সবচেয়ে কল্পনামূলকভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

‘কাকতাদুয়া’ গল্পে তিন বছর আগের একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অভিরাম ছিল মৃগাঙ্কবাবুদের বিশ বছরের পুরোনো গৃহকর্মী। সবাই মনে করে শেষে একদিন অভিরামের ভীমরতি ধরে। সে মৃগাঙ্কবাবুর বিয়েতে পাওয়া সোনার ঘড়িটা নাকি চুরি করে বসে। তবে অভিরাম তার বিরুদ্ধে অমন অভিযোগ অস্বীকার করে। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবুর বাবা ওঝা ডাকিয়ে কুলোতে চাল ছুড়ে মেরে প্রমাণ করিয়ে দেন যে অভিরামই চোর। ফলে অভিরামকে তারা চাকরি থেকে বিদায় করে দেন। মৃগাঙ্কবাবুও তার বাবার বশবর্তী হয়ে অভিরামকে দোষী হিসেবে গণ্য করার বিষয়টি কোনোভাবেই কাম্য ছিল না। কুসংস্কারে অমন বিশ্বাসের ফলে তারা উভয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অভিরাম ছিল মৃগাঙ্কবাবুদের বিশ বছরের গৃহকর্মী। ফলে এখানে সহজেই অনুমেয় সে বাবুদের পরিবারটাকে কতটা আপন মনে করত। মৃগাঙ্কবাবুদের বোঝা উচিত ছিল অভিরাম তাদের এত বছরের পুরোনো একজন গৃহকর্মী, শুধু একজন ওঝার কথার ওপর ভিত্তি করে অমন বিশ্বস্ত একজন গৃহকর্মীকে এভাবে দোষী সাব্যস্ত করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া কোনোভাবেই ঠিক হয়নি। এর ফলে তারা একজন বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল গৃহকর্মীকে হারিয়েছে। কেননা পরে তারা যে গৃহকর্মীকে বাড়িতে কাজ দেয় সে ঠিকঠাক কাজ করেনি। মৃগাঙ্কবাবুদের এমন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মূল কারণ ছিল কুসংস্কারে বিশ্বাস করা। অন্যদিকে এর ফলে অভিরামের জীবনেও নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও হাহাকার।

মৃগাঙ্কবাবুদের বাড়ি থেকে অভিরামকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর সে আর কোথাও চাকরি করেনি। কারণ তার কঠিন উদুরি ব্যারাম হয়। চাকরি না থাকায় সে টাকা-পয়সার অভাবে ওষুধ, পথ্য কিছুই কিনতে পারেনি। সেই ব্যারামেই সে মৃত্যুর কোলে চলে পড়ে। যে ঘড়িটা চুরির অপবাদে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয় সেই ঘড়িটা আলমারির নিচে পেছন দিকটায় পড়ে ছিল, যা মৃগাঙ্কবাবু পরে খুঁজে পান। অথচ কুসংস্কারে বিশ্বাস করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ওঝার কথায় তাকে অযথা শাস্তি দেওয়া হয়। এর জন্যই অভিরামের জীবনে নেমে আসে দুর্বিষহ যন্ত্রণা। তাই বলা যায়, “কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাস কখনো ভালো ফল বয়ে আনতে পারে না।”— মন্তব্যটি পুরোপুরি সত্য।